আমার কথা

কার্টুন পত্রিকা 'বিষয় কার্টুনের সম্পাদক লিখছেন নিজের কথা। পত্রিকা ও নানা বই সম্পাদনার কথা এবার বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়ের নিজের কলমে।

কার্টুন নিয়ে আমার আগ্রহের সূত্রপাত ১৯৭৬-৭৭ সাল থেকে। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারে জন্মের সুবাদে চার পাঁচ বছর বয়সে মা সরস্বতীর কাছে বসিয়ে নতুন স্লেটে খড়ির রেখা টেনে হাতেখড়ি আর বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে দু-পাঁচটা রঙ্গীন ছবির বই হাতে এসে পড়া। বেশ মনে আছে প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছড়া ছবি আর পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর ছবিতে রামায়ণের সঙ্গে চাক্ষুষ দেখা ঐ বয়সেই। দুটো বইয়ের ছবিগুলো এত ভালো লেগে গিয়েছিল, সহজে আমার কাছছাড়া হতো না। যেহেতু তখন অক্ষর পরিচয়টা সড়গড় হয়নি, তাই মা বা দিদিদের কাছে আব্দার করে অতিষ্ঠ করে তুলতাম যে ছবিগুলোর মানে আমায় বুঝিয়ে দেবার জন্য। রিডিং পড়তে না পারলেও ছবি দেখে দেখে গল্প বা ছড়ার মানে তখন বুঝতে পারতাম।

আমি স্কুলে ভর্তি হই ঠিক ছয় বছর বয়সে ক্লাস টু-তে, যেহেতু তখন ভর্তির বয়স ক্লাস ওয়ানে ছয় বছর নির্দিষ্ট ছিল এবং টু-তে সাত বছর সেহেতু ভর্তির আগে আমার জন্মতারিখটা এক বছর এগিয়ে আনতে হল, ফলস্বরূপ ৫৯ বছর বয়সে আমাকে অবসর নিতে হল ... যাক্ সে কথা।

স্কুলে ভর্তি হয়ে কিছু নতুন বই হাতে এসে পড়লো যেগুলো টেক্সট বই। তার আগেই আমি সহজ বাংলা বা ইংরেজি বাড়িতেই পড়তে শিখে গিয়েছি। দিদিদের ছোটবেলার ছবির বইগুলো আমার হাতে এসে গিয়েছে। যোগীন সরকারের *হাসিখুশি*, সুনির্মল বসুর *রাজভোগ*, *বেড়েমজা*, *হট্টগোল*, সুকুমার রায়ের *আবোল তাবোল*, দেব সাহিত্য কুটিরের ছবিওলা চমৎকার ছাপা চটি বই, সেই সঙ্গে ম্যাকমিলান কোম্পানীর চমৎকার সব বাংলা বই। যেমন গল্প তেমন ছবি। একটা বই যেটা এখনও আমার কাছে আছে – সাত ভাই চম্পার গল্প। মোটা কার্ডবোর্ডের পাতায় ক্যারেক্টারগুলোর কাটআউট পাতা খুললেই রাজা, রাণী, রাজকন্যা, রাজপুত্তুর, ডাইনি সব দাঁড়িয়ে উঠতো।

স্কুলের বইগুলোও বেশ চিত্রময় হতো তখন। আমার মনে আছে ক্লাস থ্রি-তে *বুনিয়াদি স্বাস্থ্য* বইতে বি. রায় আর *হিতোপদেশের গল্প* বইতে সমর দে-র ছবি ছিল। তবে তখন দিদিদের স্টকের দেব সাহিত্য কুটিরের মোটা মোটা পূজাবার্ষিকীগুলো আমার নাগালের বাইরে ছিল। তবে বেশিদিন তা নাগালের বাইরে রইলো না। সেসব বই-এর ছবি দেখে যে মুগ্ধতার শুরু তা এখনো কাটেনি।

আমার কার্টুন-প্রীতির সূত্রপাত কিন্তু বেশ ধেড়ে বয়সেই – বলতে গেলে ২১ বছর বয়সে, *টাইমস অব্ ইণ্ডিয়ায়* লক্ষ্মণের কার্টুন, *আনন্দবাজারে* চণ্ডী লাহিড়ীর তির্যক, *ইলাস্ট্রেটেড উইকলিতে* মারিও-র দারুণ মজার মজার ছবি – এগুলো বেশ মন দিয়ে দেখতে থাকি।

শুরু হল কার্টুন জমানো ও কার্টুন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ। কার্টুনের উপর যে কোন লেখা পত্র-পত্রিকায় খুঁজে পেলে সেটা সংগ্রহ করতাম। কলকাতার ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে পুরোনো ইংরেজি পত্রিকা পাওয়া যেত। *পাঞ্চ*, *ম্যাড* এসব পত্রিকা দেখার সুযোগ পেতাম, কিন্তু কিনতাম খুব কম, কারণ পকেটে রেস্তো থাকতো না। তখন আমার একাধারে ড্রাফটসম্যানশিপে ডিপ্লোমা করা আর বি.এস.সি. পড়া চলছে। ১৯৭৬-এ অ্যাপ্রেন্টিস ছিলাম ব্রেথওয়েট কোম্পানীতে, স্টাইপেন্ড মিলতো ১৫০ টাকা, তার থেকে গোটা পনেরো টাকা গাড়িভাড়ায় যেতো। বই ও পত্রিকা কেনার শখ মেটাতে একটা কোচিং ক্লাসে পড়াতে শুরু করলাম ৬০ টাকায়, আর একটা প্রাইভেট টিউশনি থেকে ৪০ টাকা। কলেজ স্ট্রীটে গিয়ে পুরোনো বই ঘাঁটতে গিয়ে ভালো বিদেশী কার্টুনের বই দেখেও অনেক সময় কিনতে পারিনি। এখনও আফসোস হয়।

১৯৮০ সালে ভদ্রস্থ চাকরি পাওয়ার পর বই-পত্রিকা কেনা অনেক বেড়ে গেলো, কিন্তু ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে গিয়ে দেখি *পাঞ্চ* পত্রিকা আসছে না, উপরন্তু যৌন পত্রিকায় দোকানগুলো ছেয়ে গিয়েছে, তবে *ম্যাড* তখনও আসতো – পাওয়া যেত *রিডার্স ডাইজেস্ট* ও *ইলাস্ট্রেটেড উইকলি*, খেলাধুলার কিছু ভালো পত্রিকা। এর মধ্যে কার্টুন দেখার আর বোঝার চেষ্টা করতে করতে আমি হাসি, মজা, ব্যঙ্গ-কৌতুকের ভক্ত হয়ে পড়েছি – পুরোনো *যষ্টিমধু* পত্রিকা চেখে মধুর স্বাদ পেয়েছি। ঘটনাক্রমে আলাপ হয়ে গেল রস সাহিত্যিক কুমারেশ ঘোষের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থমেলায়, যে মেলা অনেকদিনই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কুমারেশবাবু *যষ্টিমধু* কাগজ চালাতেন, ওনার প্রকাশনা সংস্থা ‘গ্রন্থগৃহ’-এর কলেজস্ট্রিট মার্কেটে একটি স্টল ছিল। মাইনে করা একটি আমাদের বয়সী ছেলে স্টল খুলতো ও বই-পত্রিকা বিক্রি করতো। মাঝে মাঝে কুমারেশবাবু বিকালের দিকে স্টলে এসে বসতেন। ওখানেই ‘শিব্রাম চক্রবর্তীর বইয়ের দোকান’ নামে একটি স্টল ছিল, খুব আকস্মিকভাবেই হাসির রাজা শিব্রামকে সেখানে বিষাদাচ্ছন্ন অবস্থায় বসে থাকতে দেখি।

সময় গড়াতে গড়াতে ১৯৮৯ সাল এসে গেল। এরমধ্যে পত্নী ও পুত্র লাভ করেছি। ১৯৯০ সালটা আমার কাছে স্মরণীয়। ৮৯-৯০ এর মধ্যে বাবা-মা দুজনকে হারালাম আর আলাপ হল সুকুমার রায় চৌধুরীর সঙ্গে। সুকুমারবাবু তখন রঙ্গব্যাঙ্গের পত্রিকা কার্টুন বার করতে শুরু করেছেন ও সেটার বিজ্ঞাপন দিয়েছেন আনন্দবাজারে। সেটা দেখেই ফোনে যোগাযোগ করে আমার কার্টুনাসক্তির কথা জানালাম, উনি আগ্রহের সঙ্গে আমায় আসতে বললেন। পরিচয় হল, পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হল, কার্টুন কাগজের সঙ্গে নানা কাজে জড়িয়ে পড়লাম। ইতিমধ্যে রেজিস্ট্রেশন না পেয়ে কাগজ বন্ধ হয়ে গেল, তবে সুকুমারদা হালছাড়ার পাত্র নন, নতুন নাম দিয়ে আবেদন করলেন। চারমাস পর রেজিস্ট্রেশন পেলেন সরস কার্টুন। আমার সংগ্রহ করা অনেক পুরানো কার্টুন, অবশ্যই

বাংলা পত্র-পত্রিকার এবং সরস রচনা উনি ছেপেছেন। সরস কার্টুনে আমার লেখা রম্য রচনা ও আঁকা কার্টুনও সুকুমারদা সাদরে ছেপেছেন, এর ফলে এসব বিষয়ে আমার উৎসাহও দ্বিগুণ বর্ধিত হয়েছে। কিন্তু নানা বিপর্যয়ে সরস কার্টুন বন্ধ হয়ে গেল চার বছর চলে ১৯৯৪-তে।

ইতিমধ্যে অবশ্য আমার পরিচয় হয়েছে বেহালার বাসিন্দা পবিত্র অধিকারী মশায়ের সঙ্গে, ১৯৯৩ সাল থেকে উনি রঙ্গব্যঙ্গ রসিকেষু নাম দিয়ে একটি দু-ফর্মার চটি পত্রিকা বার করতে শুরু করেছেন। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে একটা কথা বলি; আমাদের বেহালা জনপদে কিন্তু সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের ব্যক্তিত্বের অভাব ছিল না, পবিত্রদা পরিচিতদের কাছ থেকে লেখা নিয়ে পত্রিকা শুরু করেন। বাংলা ১৪০৪ সালে আমি ওনার কাগজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে পড়লাম, ঘটনাক্রমে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বৃত্তে এসে পড়েছিলেন শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। পেশায় চাকুরীজীবি, নেশা লেখালেখি ও জাদু। বেশ ভাল ম্যাজিক দেখাতে পারতেন। আমরা তিনজনের পরিকল্পনামত বিখ্যাত কার্টুনিস্ট রেবতীভূষণ ঘোষকে নিয়ে পত্রিকার একটা বিশেষ সংখ্যা বের করবো ঠিক হল। তার আগে খুব কাকতালীয়ভাবে পবিত্রবাবুর সঙ্গে রেবতীভূষণের আলাপ হয়ে গিয়েছিল আর আমি ভাবলাম আমার কার্টুন অনুসন্ধিৎসাটা এবার কাজে লেগে যাবে। রেবতীভূষণকে প্রস্তাবটা দেয়ামাত্র উনি হাঁ হাঁ করে উঠলেন, কারণ উনি ছিলেন একান্তই প্রচার বিমুখ। যাইহোক, এ ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেখা গেল ওনার স্ত্রী সুষমা ঘোষের, যিনি তখন আমাদের বৌদি হয়ে বসে আছেন। এই শুরু হল রেবতীভূষণের বাড়িতে আমার ও শৈলেশ্বরের কার্টুন অভিযান। ওনার বাড়ির একতলার একটা এঁদো ঘরে জমা হওয়া কাগজের স্তুপ ঘেঁটে আমরা গুপ্তধন অর্থাৎ ওনার আঁকা কার্টুন ও নানা ছবি উদ্ধার করতে শুরু করলাম। বৌদির উৎসাহ আর সক্রিয় সাহায্যও পেতে থাকলাম। রেবতীদা মাঝে মাঝে চটে উঠলেও শেষ পর্যন্ত আমাদের উৎপাত ওনার গা-সওয়া হয়ে গেল। বেশ ধুমধাম করেই বের হল রঙ্গব্যঙ্গ রসিকেষু-র 'রেবতীভূষণ সংখ্যা'। বাংলা আকাডেমির দোতলার প্রেক্ষাগৃহে সেই সংখ্যা উদ্বোধন করলেন ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র, উপস্থিত ছিলেন শুদ্ধসত্ত্ব বসু, সরিৎশেখর মজুমদার, আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত, ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা ও সন্দীপ দত্ত। এই ১৯৯৭ থেকেই রঙ্গব্যঙ্গ রসিকেষু-র অভিযান চলল পূর্ণদ্যোমে। পরবর্তী পর্যায়ে শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক সংখ্যা, অহীভূষণ মালিক সংখ্যা ও ১৯৯৯ সালে কাফী খাঁ শতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। উপেন্দ্র চন্দ্র মল্লিকের নাম ক'জন শুনেছেন জানি না। কিন্তু ছন্দের উপর এতখানি দখল খুব কম দেখেছি, সেই সঙ্গে অজস্র মজার ও হাসির কবিতা লিখেছেন। লিখেছেন গীতি নাটিকা ও সরস পৌরাণিক উপাখ্যান। এ সংখ্যার প্রস্তুতি শুরু হওয়ার আগেই উপেনদা প্রয়াত হলেন, তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ সংখ্যাটি প্রকাশ করা হল। উপেনদা পেশায় ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবি, ওঁর বাবা ছিলেন ইকমিক কুকারের আবিষ্কারক ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক। ভবানীপুরের সেই বিখ্যাত মল্লিকবাড়ির অন্যতম বিখ্যাত মানুষ হলেন চিত্রতারকা রঞ্জিত মল্লিক। ইতিমধ্যে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষক অধ্যাপক ডঃ প্রদীপ পারেখ রঙ্গব্যঙ্গ রসিকেষু-র দলে যোগ দিয়েছেন। উনি ভবানীপুরেই থাকতেন, মল্লিকবাড়ির প্রতিবেশী, মূলতঃ ওঁর প্রয়াসে সংখ্যাটির দুষ্প্রাপ্য কয়েকটি কবিতা ও লেখার সংকলন করা সম্ভব হয়েছিল।

অহীভূষণ মালিক – প্রখ্যাত কলা সমালোচক, লেখক ও ব্যঙ্গচিত্রী। বেহালায় ওনার সঙ্গে পরিচয়ের সুবাদে জানতে পারি ওনার বাল্যকালের কয়েকটি বছর বেহালাতেই কেটেছে, ম্যাট্রিক পাশ

করেছিলেন বেহালা ইংলিশ হাইস্কুলের থেকে যে স্কুল থেকেই বহু পরে আমি হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করি, ছাত্রজীবন কাটিয়ে। অহীভূষণ সংক্রান্ত কাজটা প্রায় পুরোটাই করতে হয়েছিল আমাকে, কারণ পবিত্রদা তখন 'বেহালা বইমেলা' সংগঠনের কাজে চূড়ান্ত ব্যস্ত। পত্রিকার কাজ ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে আমাকে পুরো অধিকার ছেড়ে দিয়েছেন। অহীভূষণের কাজ করতে গিয়ে প্রথমে যোগাযোগ করেছিলাম ওঁর ছেলে বাসুরাজ মালিকের সঙ্গে, উনি ও ওনার স্ত্রী অঞ্জনা যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু ছবি, লেখা, বইপত্তর সে সব কিছুই ওদের কাছে পাওয়া গেল না। হতাশ না হয়ে সেসব জোগাড় করতে নেমে পড়লাম। অনেক সময়ই আমার Field of Cultivation ছিল কলেজ স্ট্রিটের পুরোন বইপাড়া। এই কাজ করতে গিয়ে অনেক স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচয় হল। শিল্পী প্রকাশ কর্মকার, বিজন চৌধুরী, রবীন মণ্ডল, শুভাপ্রসন্ন, আনন্দবাজারের দেবাশীষ দেব, সমীর বিশ্বাস, কৃষ্ণেন্দু চাকী, অনুপ রায়, এরা যে সকলেই লেখা দিয়েছিলেন তা নয় কিন্তু অনেকেই দিয়েছিলেন। গণেশ হালুই ও শ্যামল দত্তরায় অসুস্থতাবশতঃ লেখা দিতে পারেননি। ব্যস্ততা সত্ত্বেও লেখা দিয়েছিলেন আজকালের প্রতাপ কুমার রায়, অসুস্থ শরীরেও লেখা দিলেন সাহিত্যিক বিমল কর, সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের পথপ্রদর্শক রাম হালদার। আনন্দবাজারের আর্ট ডিপার্টমেন্টের শংকর মণ্ডল যথাসাধ্য সহযোগিতা করেছিলেন। সংখ্যা নির্মাণের দ্বিতীয় পর্বে যোগাযোগ ও পরিচয় হল শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, শানু লাহিড়ী, সন্তোষ রোহাতগী, গীতা ভট্টাচার্য, রমাপ্রসাদ দত্তের সঙ্গে, আর্ট ক্রিটিক সন্দীপ সরকার, অন্নদা মুন্সীর কন্যা বুফু মুন্সী বাগচী ও জামাতা অভিজিৎ বাগচী প্রমুখের সঙ্গে। প্রয়াত অহীভূষণ ও অন্নদা মুন্সীর মধ্যে প্রগাঢ় মিত্রতার সম্পর্ক ছিল, সেই অজানা অধ্যায়ের কথা লিখেছিলেন বুকু মুন্সী। বাংলা আকাডেমির জীবননানন্দ সভাঘরে 'অহীভূষণ' সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেছিলেন রেবতীভূষণ।

অতঃপর পরের বছরেই অনেক তোড়জোড় করে বের হল রূপদর্শীর রঙ্গব্যঙ্গ – সে বছরেই সাংবাদিক-সাহিত্যিক রূপদর্শী অর্থাৎ গৌরকিশোর ঘোষের জীবনাবসান ঘটে। তাঁর সামগ্রিক জীবন ও সাহিত্যকর্মকে রঙ্গব্যঙ্গ রসিকেষু-র ছোট আয়তনে ধরতে পারবো না জেনেই আমরা শুধুমাত্র তাঁর রঙ্গব্যঙ্গের দিকটা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছিলাম। এই সংখ্যার জন্য যোগাযোগ এবং লেখা সংগ্রহের জন্য কম ছোটাছুটি করতে হয়নি। আমাকে অনেকভাবে এবার সাহায্য করেছিল প্রদীপ, বিশেষ করে গৌরকিশোরের ছোটদের জন্য চিন্তাভাবনার দিকটি সে অনুসন্ধানী প্রয়াস দিয়ে সংকলিত করেছিল।

২০০০ সাল ছিল একালে বিস্মৃত, ৫০-৭০ দশকের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কার্টুনিষ্ট কাফী খাঁ বা পিসিয়েলের জন্মশতবর্ষ। যিনি বাংলা রাজনৈতিক কার্টুনকে সাবালকত্বের পথে নিয়ে গেছেন একদিকে, অন্যদিকে মৌলিক স্বরচিত কাহিনী নিয়ে কমিকস নির্মাণে বাংলায় প্রায় পথপ্রদর্শকের কাজ করে গেছেন। খুব আকস্মিকভাবে দেবাশীস ঘোষ নামে বিজ্ঞাপন এজেন্সি চালানো একটি ছেলে আমাকে রজত বরণ লাহিড়ীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। তিনি কাফী খাঁ অর্থাৎ প্রফুল্ল চন্দ্র লাহিড়ীর

একমাত্র সন্তান। রজতবাবু একজন সদালাপী মানুষ, কথা শুরু করলে থামতে পারেন না। সেক্ষেত্রে আমাকে মূক শ্রোতার ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল। ওনাদের বাড়ির সকলেরই, বিশেষতঃ রজতবাবুর প্রায় কিশোরী পুত্রবধূর এ ব্যাপারে উৎসাহ ছিল দেখবার মতন। দীর্ঘদিন, রজতবাবুর প্রায় আকস্মিক প্রয়াণের পরও ওদের পরিবারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল এবং সেই যোগাযোগের সূত্র ধরেই লালমাটি প্রকাশনার নিমাই গড়াই আমার সম্পাদনায় কাফী খাঁ সমগ্র বের করেছিলেন। দুঃখের কথা দীর্ঘদিন আর ওনাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়নি। কাফী খাঁ সংখ্যা বেশ সমারোহের সঙ্গে বেহালা বইমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়। বালি থেকে ট্যাক্সিবাহনে বেহালায় এসে রেবতীভূষণ সংখ্যাটির উদ্বোধন করেছিলেন, মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন চণ্ডী লাহিড়ী ও কৃষ্ণ ধর।

কাফী খাঁ-র নিজের লেখা, আঁকা অজস্র কার্টুন, খুড়ো ও শেয়াল পণ্ডিতের কার্টুন স্ট্রিপ সহ ওনার সম্বন্ধে নানা বিশ্লেষণধর্মী রচনায় সমৃদ্ধ রঙ্গব্যঙ্গ রসিকেষু পত্রিকা পাঠকমহলে ও পত্রপত্রিকায় অভিনন্দিত হয়েছিল।

দীর্ঘ পরিশ্রমের ফসল ছিল শৈল চক্রবর্তী সংখ্যা। রস সাহিত্যের এই অনন্য আলঙ্কারিক শিশু সাহিত্যিক শিল্পীর এই দুটি দিক ছাড়াও শৈলবাবুর আর এক প্রয়াস পুতুল নাচ বা পাপেট্রি-র রূপায়ণ নিয়েও এই সংখ্যায় আলোকপাত করা হয়েছিল। এই কাজে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছিলেন শৈবাল, অমিতাভ এবং নমিতা চক্রবর্তী। দুষ্প্রাপ্য ছবি দিয়ে সংখ্যাটিকে সাজাতে সহায়তা করেছিলেন সৌম্যেন পাল। যার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় কলকাতা ময়দানের বইমেলায়, সে পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর পর্যায়ে যেতে যেতে এমন হয়েছে বিষয় কার্টুন পত্রিকার শুরু থেকে সৌম্যেন সম্পাদকীয় মণ্ডলীতে থেকে গেছে আর ওর মুদ্রণ শিল্পের ক্রমঅর্জিত অভিজ্ঞতা এই পত্রিকার কাজে এসেছে বহুবার।

শৈল চক্রবর্তীর কাজ করার পর 'ভোটরঙ্গ' ও 'ম্যাজিক' এই দুটি অভিনব সংখ্যাও প্রকাশিত হয়েছিল রঙ্গব্যঙ্গ রসিকেষুর মাধ্যমে। রস সাহিত্যিক অ-কৃ-ব অর্থাৎ অজিত কৃষ্ণ বসু-র আর একটি সংখ্যা ছিল ব্যতিক্রমী সংখ্যা। ওনার নানা লেখা ও ওনার উপর কয়েকটি মূল্যবান লেখায় সংখ্যাটি ছিল সমৃদ্ধ। প্রশংসাও পেয়েছিল রসিকজনের।

কিন্তু এরপর আমাকে পাড়ি জমাতে হয়েছিল উত্তরবঙ্গে, কর্মস্থলে বদলির সুবাদে। ২০০৬ সালে বিষয় কার্টুন পত্রিকার সূত্রপাত, যে পত্রিকা বের করতে আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন স্বয়ং রেবতীভূষণ। তরুণ সাহিত্যপ্রেমী বন্ধু সুগত রায় ও তরুণতর কার্টুনিস্ট বন্ধু ঋতুপর্ণ বসুর অনুপ্রেরণায় বিষয় কার্টুন পত্রিকার পরিকল্পনা ও প্রকাশ সম্ভব হয়। প্রথম সংখ্যা ছিল দক্ষিণ ভারতীয় কার্টুন শিল্পী পি. কে. এস. কুট্টিকে নিয়ে, যিনি বাঙ্গালী না হয়েও কার্টুনের মাধ্যমে কলকাতার মানুষের কাছে অত্যন্ত পরিচিত ও জনপ্রিয় নাম। আশ্চর্যের কথা, কুট্টি সাহেব তখন কলকাতাতেই নেই, আজকাল কাগজের সঙ্গে ওনার contract extension হয়নি, ইতিমধ্যে বেঙ্গল অম্বুজা হাউসিং-এ উনি একটা ফ্ল্যাট কিনে পাকাপাকিভাবে কলকাতায় থেকে যাবেন ঠিক করেছিলেন। ঘটনাচক্রে তখন উনি আমেরিকাতে, ওনার ছেলে এবং বিবাহিতা মেয়ে দুজনেই থাকেন ওদেশে। কুট্টি সাহেবের আত্মীয় এক কেরালিয়ান ভদ্রলোকের সন্ধান পাওয়া গেল আজকালের সম্পাদক অশোক দাশগুপ্ত মারফত, সেইমত এক রবিবারের সকালে শরৎবোস রোডের

ঠিকানায় সে ভদ্রলোকের কাছে হাজির হলাম। একবিন্দুও বাংলা জানেন না, কথাবার্তা চললো ইংরেজিতেই। ভদ্রলোকটিকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে উনি খুব উৎসাহী হয়ে উঠলেন, তখনই ফোনে I.S.D. করে কুট্টি সাহেবের সঙ্গে কথা বলে আমার হাতে রিসিভার ধরিয়ে দিলেন। কুট্টি নিজেও বাংলা বলতে পারেন না, তবে কিছুটা বুঝতে পারেন। হৈ হৈ করে কথা বলতে লাগলেন, অনুমতিও দিলেন খুশি হয়ে।

বিষয় কার্টুন আত্মপ্রকাশ করলো 'কুট্টিসংখ্যা'-র মাধ্যমে। মজার একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছিল তার ঠিক এক মাস আগে। কলকাতায় রটে গিয়েছিল কুট্টি মারা গেছেন; শেষে আজকাল থেকে ওরা যোগাযোগ করে জানতে পারে উনি দিব্যি বেঁচে। রসিক ব্যঙ্গচিত্রী এরপরই আজকালে একটা নিজের ছবি এঁকে পাঠিয়ে দিলেন যে কুট্টি সাহেব নাইট গাউন পরে হাত তুলে বলছেন আমি বেঁচে আছি। সে ব্যাপারটা ওনাকে ফোনে বলাতে ওঁর কি হাসি! যাইহোক প্রথম যাত্রাতেই বিষয় কার্টুন বেশ নাম করে ফেললো, আজো কেউ কেউ কুট্টির সেই সংখ্যাটা আছে কি না জাতে চান। এখানেই শেষ নয়, এরপর বন্ধু প্রদীপের সঙ্গে ই-মেল মারফত কুট্টি সাহেবের চিঠি চালাচালি চললো বেশ কিছুকাল, ওনার প্রত্যেক মেল-এ আমি কেমন আছি ও নতুন কি কাজ করছি জানতে চাইতেন। পত্রিকার সংখ্যা এক কপি ওনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল আগেই কিন্তু উনি তার লেখাগুলো পড়তে পারেননি, ছবিগুলো তারিফ করেছেন। দীর্ঘদিন এই যোগাযোগটা ছিল, ওনার চোখের সমস্যার জন্য ক্রমশ সেটা বন্ধ হয়ে গেল। একটা কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলি, আমাদের কাগজের জন্য উনি চব্বিশশো টাকার চেক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আর তার আগে আমরা ওনাকে পনেরো কপি পত্রিকা রেজিস্টার্ড পার্সেল করে আমেরিকাতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, তার দামও আর একটা চেকে উনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

বিষয় কার্টুনের পরবর্তী সংখ্যা ছিল '১২৫ বর্ষে যতীন্দ্র কুমার সেন' ব্যঙ্গচিত্রী ও শিল্পী যতীন্দ্র কুমার ওরফে যতীন সেন (নারদ) মূলতঃ রাজশেখর বসুর লেখার সঙ্গে যুতসই ছবি এঁকে পাঠক সমাজে জনপ্রিয় হন, ইনি অবিবাহিত ছিলেন, আমাদের কাজের আগেই ওনার ভ্রাতুস্পুত্র লেখক চিরঞ্জীব সেনের দেহান্তর ঘটে গেছে। বন্ধুবর সৌগতের দৌলতে পরিচয় হয়ে গেল প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাক্তন অর্থনীতির অধ্যাপক দীপংকর বসুর সঙ্গে। যিনি রাজশেখরের দৌহিত্রী আশাদেবীর একমাত্র পুত্র। রাজশেখরের বকুলতলা রো-র সেই বসতবাড়িতে উনি থাকেন, অবিবাহিত জীবন কাটান। বেশ কয়েকদিন ধরে আমার আর সুগতর ওনার সঙ্গে সে বাড়িতে সান্ধ্য আড্ডা বসতে লাগলো। আড্ডা থেকে উঠে এলো অনেক অজানা তথ্য যার সমন্বয় করে দীপঙ্কর বাবুর একটা দীর্ঘ সাক্ষাৎকার ছিল সেই সংখ্যার বিরল বিষয় পাওয়া গেল অপ্রকাশিত কিছু ছবি, পুরোনো পত্রিকা থেকে দুষ্প্রাপ্য লেখা, সব মিলিয়ে এই সংখ্যাও 'হিট' করে গেল। অর্থাভাবে ছাপা হয়েছিল মাত্র তিনশ কপি, দু-মাসের মধ্যেই যা নিঃশেষিত হয়ে যায়।

আমি কর্মসূত্রে মালদহ টাউনে থাকাকালীনই বের হয় 'টিনটিনের স্রষ্টা শিল্পী হার্জের শতবর্ষ সংখ্যা'। কার্টুনিষ্ট ঋতুপর্ণ বসু কলকাতা থেকে এ সংখ্যার লেখাগুলো কুরিয়র মারফত আমাকে পাঠাতো, আমি সেগুলো এডিট করার পর আবার ওকে কলকাতায় গিয়ে দিয়ে আসতাম। তারপর কম্পোজ হতে সেগুলো চলে যেতো আমার ভাগ্নে শুভব্রতর কাছে, যে প্রথম সংখ্যা থেকে পত্রিকার কম্পোজের কাজটা করে আসছিল। হার্জ সম্পর্কে বেশ কিছু ফরাসী ভাষায় লেখা পাওয়া গিয়েছিল,

ঋতুপর্ণের বাবা ফ্রেঞ্চ জানতেন বলে লেখাগুলোর পাঠোদ্ধারের কাজটা উনি করে দিয়েছিলেন। ঋতুপর্ণ টিনটিন সংক্রান্ত নানান ছবি ও স্কেচ সংগ্রহ করে দিয়েছিল। যেহেতু রঙ্গীন ছবি ছাপা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, অনেক রঙ্গীন ছবির ফিগার সাদা-কালো স্কেচের মাধ্যমে নকল করেও দিয়েছিল। সব মিলিয়ে বিষয় কার্টুনের সেই সংখ্যা টিনটিন অনুরাগীদের কাছে বেশ পছন্দসই হয়েছিল।

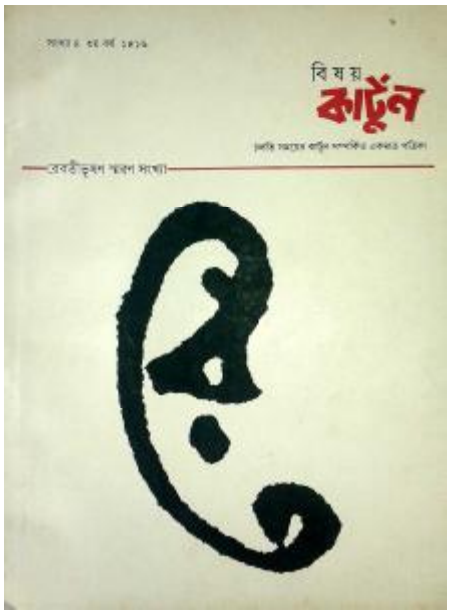

এরপর রেবতীভূষণকে নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কাজের ভাবনা মাথায় এসেছিল। রেবতীদা তখন প্রয়াত, সুষমা বৌদি হরিয়ানায় বড় ছেলের কাছে বাস করছেন, তাদের সাগ্রহ অনুমোদন সহজেই পাওয়া গেল। রেবতীদা বেঁচে থাকাকালীন শিল্পী দেবাশীষ দেব ওনার একটা অন্যধরণের সাক্ষাৎকার নিতে শুরু করেছিলেন। সেইসাথে ক্যামেরায় সেটা তুলেও রাখছিলেন, সেইসাথে ক্যামেরায় সেটা তুলেও রাখছিলেন, উনি যখন ক্যামেরা চালাচ্ছেন তখন রেবতীদার সঙ্গে কথোপকথন চালিয়ে যাবার কাজটা আমি চালিয়ে দিতাম। কয়েকটি বিরল মুহূর্ত ধরা পড়েছিল চলমান ছবিতে রেবতীদার অমূল্য স্মৃতি নিয়ে। দেবাশীষদা দুই সিনিয়র কার্টুনিষ্ট চণ্ডী লাহিড়ী ও অমল চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকারও একইভাবে ক্যামেরায় ধরে রেখেছেন। যা হোক এবার আমার অনুরোধে দেবাশীষ দেব টেপ ও ক্যামেরায় তোলা সেই সাক্ষাৎকার লিপিবদ্ধ করে দিলেন। রঙ্গব্যঙ্গ রসিকেষুতে প্রথম রেবতীদার যে আত্মকথা ‘নিজেকে হারায়ে খুঁজি’ বেরিয়েছিল সেটাও ছিল ওনার সঙ্গে দীর্ঘ কথোপকথন বা আড্ডার সারাৎসার, কারণ আক্ষরিক সাক্ষাৎকার দিতে ওঁর ঘোর আপত্তি ছিল। সংখ্যা বেরিয়ে যাবার পরও ওনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছেদ হল না, যাতায়াত চলতে লাগলো। মাঝে মাঝে মনের অর্গল খুলে দিতেন, তখন অতীত স্মৃতির টুকরোটাকরা বেরিয়ে আসতো। বাড়ি ফিরে গিয়ে সেগুলোই নোট করে রাখতাম। এখন সেই অতীতচারিতাই রূপ পেলো দীর্ঘতর এক লেখায়। তাছাড়া ওঁর আরো কিছু দুষ্প্রাপ্য লেখা, কার্টুন, স্কেচ, বই-এর অলংকরণ, আমাকে লেখা নানা সময় ওঁর চিঠির প্রতিলিপি বিষয় কার্টুনের ‘রেবতীভূষণ’ সংখ্যাকে সমৃদ্ধতর করেছিল। রেবতীভূষণের স্বাক্ষর ‘রে’ অক্ষরটুকু নিয়ে চমকপ্রদ প্রচ্ছদ তৈরি করেছিল সৌম্যেন পাল।

শিল্পী সমর দে-ও আজ এক অবজ্ঞাত শিল্পী, যাকে নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সংখ্যার পরিকল্পনা ছিল আমার একান্ত নিজস্ব। সুগত রায়ের প্রচেষ্টায় সমর দে-র কন্যা টুলটুল মৌলিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছিল। শ্রী দে-র কনিষ্ঠা কন্যা মুনমুন বিশ্বাসও একজন ভালো চিত্রশিল্পী, বিবাহসূত্রে হরিয়ানায় থাকেন, সেখান থেকে ডাকযোগে তাঁর বাবার উপর একটি চমৎকার লেখা ও প্রবীণ বয়সের প্রতিকৃতি এঁকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে। সমর দে-র ছবির একটা অদ্ভুত স্টাইল আছে, ছবির প্রতিটি চরিত্রই সজীব আর চঞ্চল, ওনার আঁকা ছোট ছেলেমেয়েরা আশ্চর্য প্রাণবন্ত।

আগেই লেখা উচিৎ ছিল ‘ময়ূখ চৌধুরী’ সংখ্যার কথা। বিষয় কার্টুনের এই বিশেষ সংখ্যাটি পাঠকের কাছে বিশেষতঃ ময়ূখ অনুরাগীদের কাছে অত্যন্ত সমাদর লাভ করেছিল। কৈশোর থেকে অনেকের মতো আমিও ময়ূখের রোমাঞ্চকর কমিকস ও অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির ভক্ত, আশ্চর্য্য

গতিময় সব ছবি, তেমনি কাহিনির উত্তেজনা। প্রথম কোনো বাঙ্গালী কমিকস শিল্পীকে নিয়ে কাজ হল ও একটি পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের মাধ্যমে প্রায় হারিয়ে যাওয়া শিল্পীকে ফিরিয়ে আনা হল ছবি ও লেখার মাধ্যমে। ময়ূখ সংখ্যার প্রস্তাব দিয়েছিলেন সন্দেশ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত, আমার পূর্ব-পরিচিত দেবাশীষ সেন। সত্যজিৎ রায় ও সন্দেশ পত্রিকার সঙ্গে ময়ূখের সম্পর্কের একটা রসায়ন এর মূলে কাজ করেছিল। মনে আছে ময়ূখ সম্পর্কে একটা পুরোনো লেখার কপি জোগাড় করতে পাণ্ডুয়া যাত্রা করতে হয়েছিল, যেতে হয়েছিল বোলপুরে, বোলপুরের বাসিন্দা তরুণ শিক্ষক সৈকত শোভন পাল, ময়ূখ অনুরাগী মানুষটি নিজেও ছবি আঁকেন ও লেখালেখি করেন। তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের রেশ এখনও চলে যায়নি, পরেও বেশ কয়েকবার বোলপুর গেছি। বিভিন্ন ময়ূখ অঙ্কিত গ্রন্থচিত্র ও নিজের একটি তথ্যবহুল লেখা দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছিল সৈকত। একই সময় পাশে পেয়েছিলাম গ্রন্থপ্রেমী ও গ্রন্থ সংগ্রাহক দেবশীস গুপ্তকে। সমর দে সংখ্যা বের করা হতই না ওনার সহযোগিতা না পেলে। পুরোন শিশুসাথী পত্রিকা ঘেঁটে উনি সমর দে-র কয়েকটি লেখার হদিশ দিয়েছিলেন। এবার ময়ূখ সংখ্যা হবে জেনে উনি খুব উৎসাহী হয়ে প্রয়োজনীয় কয়েকটি বই ও নিজের লেখা প্রবন্ধ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। সুগতর মাধ্যমে যোগাযোগ হয়েছিল ময়ূখের আর্ট কলেজের সহপাঠী অমিতাভর সঙ্গে। দেবাশীস সেন ময়ূখের প্রায় সমস্ত লেখা ও কমিকসের পর্যালোচনা করে দীর্ঘ লেখা উপহার দিয়েছিলেন।

সুগত রায়ের অনেকদিনের অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে শিল্পী খালেদ চৌধুরীর উপর একটি সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলাম। খালেদ চৌধুরী এক বহুমুখী ব্যক্তিত্ব। চিত্রশিল্পীতো বটেই, বাংলা নাটকের মঞ্চসজ্জা রূপায়ণের দক্ষ রূপকার, লোকসঙ্গীতের সংগ্রাহক ও বিশেষজ্ঞ, নিজেও সঙ্গীতশিল্পী, নানান বাদ্যযন্ত্রের উপর অসাধারণ দখল। এই রকম মানুষের সবদিককে তুলে ধরা আমাদের ক্ষুদ্র পত্রিকার পক্ষে অসম্ভব। তাই ঠিক করেছিলাম শুধুমাত্র ওনার চিত্রশিল্পের দিকটাই এই সংখ্যায় তুলে ধরা হবে। বাংলা বইয়ের জগতে খালেদদার প্রচ্ছদগুলির অধিকাংশই আমাদের মনে বিস্ময় ও সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। বইয়ের বিষয়টিকে একটি প্রচ্ছদের মধ্যে ফুটিয়ে তোলার দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করতেন এই মানুষটি অথচ প্রথাগত শিল্পশিক্ষা বা লেখাপড়া কোনটাই তাঁর ছিল না।

খালেদ সংখ্যার কাজ করতে গিয়ে সংস্পর্শে এসেছিলাম প্রদীপ দত্ত ও কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্তের। একনিষ্ঠ খালেদ গবেষক ও সংগ্রাহক এই প্রদীপ দত্ত হলেন খালেদদার খুব কাছের মানুষ। আমার প্রত্যাশা মতো সহযোগিতা করেছিলেন প্রদীপ বাবু, সংখ্যাটি রূপায়ণে ওঁর সহৃদয় ব্যবহারও আমাকে উৎসাহিত করেছিল। বহরমপুর নিবাসী তরুণ শিল্পী কৃষ্ণজিতের সঙ্গে পরিচয় হওয়াটাও আমার সেসময়ের পরম প্রাপ্তি। তাঁর একটি তথ্যপূর্ণ নিবন্ধ ছাপা হয়েছিল সেই সংখ্যায় এবং সেই থেকে আমি কৃষ্ণজিতের 'বিশ্বদা' হয়ে গেছি। সংখ্যাটির ছাপা হওয়া প্রথম সংখ্যাটি বার্ধক্য নিপীড়িত

শ্রদ্ধেয় শিল্পীর হাতে তুলে দেবার সৌভাগ্যও আমার হয়েছিল। এর কিছুকাল পরেই অসামান্য মানুষটির জীবনাবসান হয়।

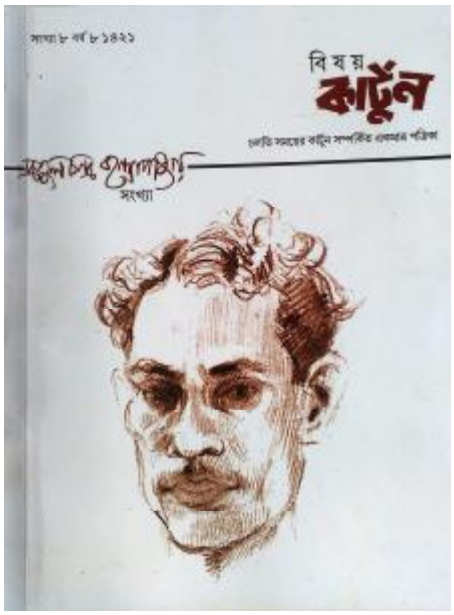

বিষয় কার্টুনের এখন পর্যন্ত শেষ সংখ্যা প্রতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধায়কে নিয়ে। ছেলেবেলা থেকে অবাক ভালোলাগা নিয়ে যাঁর ছবি দেখেছি। কি সাদাকালো কি জলরং-এর আশ্চর্য জাদুতে মুগ্ধ হয়েছি, সেই শিল্পীর জন্মশতবর্ষ প্রায় অজান্তে চলে গিয়েছে ২০০৩ সালে, মৃত্যুর পর কেটে গেছে দীর্ঘ চল্লিশ বছর। সংখ্যাটি বের করার পর টের পেলাম অনেক মানুষের মত সেই ভালোলাগা কৈশোরের স্মৃতি আবার ফিরে এসেছে। বিশেষ সমাদর পেয়েছিল কাজটি এবং উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকার কলকাতার কড়চা বিভাগে। সুগত রায় ও নাট্য নির্দেশক পঙ্কজ মুন্সীর যোগাযোগে পাওয়া গিয়েছিল প্রতুল চন্দ্রের একমাত্র পুত্র প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ, যিনি নিজেও একজন চিত্রশিল্পী। প্রসাদবাবু পরম সমাদরের সঙ্গে আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, কিন্তু ওনার কাছ থেকে প্রতুল বাবুর ছবি বা বই কিছুই পাওয়া গেল না, তবে পাওয়া গেল বহু পুরাতন হলদে হয়ে যাওয়া একটি এক্সারসাইজ খাতা, যার পাতায় প্রতুলবাবু নিজের জীবনের কাহিনী লিখতে শুরু করেছিলেন – ওনার শৈশব থেকে তরুণ বয়সের সূচনায় গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত। শেষে মৃত্যু এসে মানুষটির কলমের চলা তথা জীবনের পথ চলা থামিয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যে আলাপ হয়ে গিয়েছিল উদ্যমী যুবক শান্তনু ঘোষের সঙ্গে যার কথা পরে বলবো। ওর মাধ্যমে দেখা ও কথা হল ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। খুব বিনীত স্বভাবের মানুষটির নেশা শিশুসাহিত্যের পুরোন বই, কমিকস ইত্যাদি সংগ্রহ করা। দেব সাহিত্য কুটিরের অনেকগুলি পূজাবার্ষিকী ও বইয়ের প্রচ্ছদ ও ভেতরের ছবি উনি নিজে স্ক্যান করে দিলেন। অনুরূপ সহযোগিতা পাওয়া গেল চন্দননাগরিক দেবাশীস গুপ্ত ও সন্দেশের দেবাশীসের কাছ থেকে। দুই দেবাশীসের দেওয়া ছবিতে সংখ্যাটি বেশ ভালো ডকুমেন্টারীর মর্য্যাদা পেয়েছিল।

মোটামুটি এই হল কার্টুন ও ছবিকে ভালবেসে আমার এতদূর আসার গল্প। নানা কারণে এখন বিষয় কার্টুন নিয়মিত বার করতে পারি না বলে পত্রিকার অনুরাগীদের সপ্রশ্ন অনুযোগের মুখে পড়তে হয়। আমার পত্রিকা যে এত মানুষের ভালোলাগার বিষয় হবে তা তো জানতাম না। নিছক নিজের ভালোলাগা থেকে এই কাজ শুরু করেছিলাম। বলাবাহুল্য, আমি নিজেকে লিটল ম্যাগ জগতের একজন কর্মী বলেই মনে করি, বিষয় কার্টুনকে বাণিজ্যিক দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা অনেকে বলেন, কিন্তু মনের দিক থেকে তার সায় পাই না। বিষয় কার্টুন বরং মেঠোপথেই চলুক, বাণিজ্যিক পত্রিকার ঝাঁ চকচকে পথে তার চলার দরকার নেই।

প্রায় বাইশ বছর পত্র-পত্রিকার জগত পরিক্রমার ফাঁকে পেয়েছি অনেক কিছু। নাম যশ না পেলেও আমার নামটা অনেকের কাছে পরিচিতি পেয়ে গিয়েছে। অনেক তরুণ বন্ধু পেয়েছি যারা বই পড়েন, ভালোবাসেন, কেজো জগতের বাইরের জগতকে জানার আগ্রহও যাদের আছে। অনেকেই

খুব গুণী, ভালো ছবি আঁকেন, সাহিত্য চর্চা করেন। অনেক খ্যাতকীর্তি মানুষের সংস্পর্শে এসেছি, শিখেছি অনেক কিছু। ফেলে আসা এতগুলো বছরের স্মৃতি মনে সযত্নে সঞ্চয় করে রেখেছি।

সম্প্রতি কমিকস ও গ্রাফিক্স নামক বৃহদায়তনের একটি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছি যে পত্রিকা আসলে আমার উদ্যোগী বন্ধু শান্তনুর মানস সন্তান। তাঁর উৎসাহের কাছে হার মেনে পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব নিতে হয়েছে, কিন্তু কাজটা খুব একটা কঠিন হয়ে ওঠেনি তার কৃতিত্বও শান্তনুর। যার আর এক কৃতিত্ব প্রায় পাঁচ দশক ধরে কাজ করে চলা শিল্পী নারায়ণ দেবনাথকে উপেক্ষার অন্ধকার থেকে স্বীকৃতির আলোয় নিয়ে আসা। তবে জানি না শান্তনুর আন্তরিক প্রয়াস সত্ত্বেও অবাণিজ্যিকভাবে এই ব্যয়বহুল পত্রিকা চালানো সম্ভব হবে কি না? তবে যেটা জানি সেটা আমাদের অনেক বন্ধুরা এই পত্রিকাকে ভালবেসে নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। হয়তো সেই সাহায্যের মৃদুমন্দ বাতাসেই পত্রিকাতরণী বিপরীত স্রোতেই চলবে।

চিত্র পরিচিতি : ১। বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়; ২। বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়ের আরেকটি আলোকচিত্র; ৩। কার্টুন রঙ্গ বিচিত্রা বই এর প্রচ্ছদ; ৪। বিষয় কার্টুন : রেবতীভূষণ স্মরণ সংখ্যার প্রচ্ছদ; ৫। বিষয় কার্টুন : খালেদ চৌধুরী সংখ্যার প্রচ্ছদ; ৬। বিষয় কার্টুন : প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যার প্রচ্ছদ; ৭। কমিক্স ও গ্রাফিক্স : প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ।